বিদ্যালয়ের রাজনীতি

সোমেন চক্রবর্তী

'The document is not the forunate tool of a history that is primarily and fundamentally memory.'
(michel Foucault. The archaeology of Knowledge. 1972)

২০০৩ সালের ২৯ জানুযারি 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত সুলুক শিবরক্ষ নামে থাইল্যান্ডের মানবাধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকারের একটি ছোট অংশ তুলে ধরে আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যাওয়ার চেষ্টা করল। স্বদেশের সামরিক জুন্ট দ্বারা নির্যাতিত হয়ে শেষ পর্যন্ত এই সন্ন্যাসী স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হন। এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মাচরণে এত প্রভেদ দেখা যায় কেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার মতে, মোটা হরফে লেখা বৌদ্ধধর্ম ও ছোট হরফে লেখা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একটা ভেদরেখা আছে। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধধর্ম মোটা হরফের বৌদ্ধধর্ম, সেখানে রাষ্ট্রশক্তি ধর্মকে ক্ষমতার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। আমি ছোট হরফে লেখা বৌদ্ধধর্মে পক্ষপাতী, যা অহিংস, বাস্তববাদী ও মানুষের দুঃখ নিরসনে তৎপর।'

এখানে উল্লিখিত 'বড় হরফ' এবং 'ছোট হরফ' এর পার্থক্যকে আমি 'বড় বৃত্ত' এবং 'ছোট বৃত্ত' হিসাবে ধরে নিয়ে দেখাতে চেষ্টা করব কীভাবে সমসাময়িককালে পশ্চিমবাংলার বিদ্যালয় স্তরে রাজনীতির খেলা চলে। এই রাজনীতিকে 'বড় বৃত্তের' আঙিনায় দেখার অভ্যাসে সাধারণত আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার মনে হয় 'বড় বৃত্ত' এবং 'ছোট বৃত্তের' মধ্যে সমরূপতার চেয়েও বিপরীতমুখী প্রবণতা এবং আপোসের আপাত অদৃশ্যমান অথচ সদা সক্রিয় রাজনীতির খেলা এখানে চলেছে। আমার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে এই দুই বৃত্তের সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার চালচিত্রকে তুলে ধরব তথ্য, তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার যৌথ মিশেল হিসাবে। বিগত ত্রিশ বছরের অধিককালব্যাপী একটি দল ক্ষমতাসীন থাকার ফলে এবং বামপন্থী দলের চরিত্রগত কারণেই পশ্চিমবাংলা পরিণত হয়েছে রেজিমেন্টেশনে এমনই একটা রূপে যার বহিরঙ্গ গণতান্ত্রিকতার মোড়কে সুসজ্জিত। তাই গলি থেকে রাজপথ সমস্ত ক্ষেত্রগুলি কোনও না কোনভাবে পরিণত হয়েছে ক্ষমতা প্রদর্শন বা ক্ষমতাকে বজায় রাখার দৃশ্যমান বা আপাত অদৃশ্যমান চারণক্ষেত্রে। আমার আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে 'বিদ্যালয়' থাকায় তাতে একই সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটাকে আমরা খুঁজতে চেষ্টা করব।

'বিদ্যালয়' নিজে প্রতিষ্ঠানগতভাবে জনপরিসরে সাধারণভাবে হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক মূল্যবোধের স্থায়ী আঁতুরঘর। সমাজ ও রাজনীতি একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজ, রাজনীতির পরিধি থেকে অনেকটাই বৃহৎ জায়গাকে ধারণ করে। 'প্রাক-আধুনিকতার পিছুটান ও ইংরেজি আধুনিকতার সম্মুখগতির টানাপোড়েনে বাঙালির মননে তাই সাবেকিয়ানা ও জঙ্গিপনা, আবেগ ও যুক্তি, বশ্যতা ও স্বাধীনতার যে সংশ্লেষ ঘটল, স্বাধীনতার উত্তরপর্বে সেটাই হয়ে দাঁড়াল ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তি বাঙালি মনের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি।'[১] বাঙালি তার স্বকীয়তা ও সাবেকিয়ানাকে খুঁজতে মেতে ওঠে পুজোপার্বণ থেকে হরকেরকমের আচার অনুষ্ঠানে। বাঙালি সমাজবোধ এখনও প্রাক্-আধুনিকতার সীমানাকে অতিক্রম করে লোকনিন্দার সম্মুখীন হতে চায় না। যুক্তিহীনতা ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ বাঙালির মননে আজও কি প্রবল দাপটের সাথে রাজত্ব করছে। ঢাকুরিয়ার সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র অবস্থায় থাকাকালীন দেখেছি (১৯৮৪-৮৮), স্কুলের জমি সংক্রান্ত বিবদমান মামলায় জেতার পর প্রধান শিক্ষিকা কর্তৃক শনি ও সত্যনারায়ণের পুজো দেওয়া এবং পরের দিন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহকর্মী শিক্ষিকাদের দ্বারা অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণভাবে পূজোর বাতাসা বিলি করার ঘটনা। আধুনিকমনা বাঙালি তাই কম্পিউটারের মাউস বা বোতাম যে হাতে টেপেন, সেই হাতেই আবার গ্রহরত্ন ধারণ করতে পিছপা হন না। উদাহরণস্বরূপ, বিগত চার বছর সমকাল ধরে যাদবপুরের একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশকালীন শিক্ষকতা করার সময় দেখেছি, পদার্থবিদ্যা এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দাতা হিসাবে শিক্ষকদের গ্রহরত্ন, তাবিজ-কবজ ধারণের ধুম। আবার একই সাথে বাংলা বিভাগের আরেক শিক্ষককে দেখেছি শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্রহরত্ন বিক্রির বেশ ভাল পার্ট টাইম ব্যবসা চালাতে। মজার ব্যাপার হল, দুজনেই কিন্তু আবার বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।

এই ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশ অনান্য মানুষের মতোই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী আধুনিকতার রসে জারিত হয়ে সামগ্রিকভাবে বাঙালি মননে যে জীবনবোধটি সঞ্চারিত হয়েছে তা থেকে কোনও যথার্থ জীবনদর্শন উৎসারিত হয় না। এই বোধ জীবনের সব কিছুকেই দেখে উপযোগিতা ও স্বার্থের মাপকাঠিতে। বিশ্বায়নের কাঁধে ভর দিয়ে এই বোধ পর্যবসিত হয় এক ধরনের অতি নিকৃষ্ট, বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদে, যেখানে সমাজ বা কোনও ধরনের সামাজিক স্বার্থের ধারণাকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক আখ্যা দেওয়া হয়। আর তাই যে শিক্ষক সমাজের হাত ধরে সামাজিক রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিত, তা পরিণত হচ্ছে বন্ধ্যাত্বকরণে। এরই পাশাপাশি বিদ্যালয় তারর প্রাতিষ্ঠানিক সমাজিক গ্রহণীয়তাকে হারিয়ে ফেলেছে। তার জায়গা নিতে সারোগেট মাদারের মতো। উপস্থিত হচ্ছে এন জি ও কর্পোরেট হাইস।

বুদ্ধিমার্গীয় প্রবঞ্চনা

নাগরিক মন যত বিবর্ণ ও বিকৃত হতে থাকে তত নিত্য নতুন লেবেল ও মোড়ক বদলায় এবং বোঝা যায় যে লেবেলের তলায় যে মন তা শীতের পাষাণের মতো হিম শীতল। কোনও উত্তাপ নেই। তাই কৃত্রিম তাপের জন্য সমাজের অন্যান্য নাগরিক মনের মতোই শিক্ষকদের একটা বিরাট অংশ সর্বদাই উন্মুখ। তাপ মানে উত্তেজনা, প্রবল থেকে প্রবলতর উত্তেজনা। প্রসঙ্গক্রমেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে হারবার্ট মার্কিউজ এর 'One Dimensional Man' -এর ধারণা। তাঁর একমাত্রিক মানবের ধারণা ছিল আধুনিক ভোগবাদী সমাজে 'প্রকৃত ব্যক্তি মানুষের' অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জোরালো তাত্ত্বিক আক্রমণ। এই 'একমাত্রিক মানব' সেই ধরনের ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ যাতে আছে কোনও কিছুকে সমালোচনাহীনভাবে গ্রহণে অভ্যস্ত, প্রবহমান কর্তৃত্বের দ্বারা আরোপিত 'প্রয়োজনের মরীচিকার' পিছনে ধাবমান এবং সর্বোপরি এই ব্যবস্থা দ্বারা বশীভূত মানব। মার্কিউজ প্রকৃত ব্যক্তি মানুষ বলতে সেই মানুষকে বুঝিয়েছেন, যার নিজস্ব চিন্তনের সক্ষমতা আছে। কোনটা গ্রহণীয় এবং কোনটি বর্জনীয় তার সিদ্ধান্ত সে স্বতন্ত্রভাবে নিতে পারে। প্রকৃত ব্যক্তি মানুষ তাঁর আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে সক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তা দিয়ে সে সীমারেখা বা ভেদরেখা টানতে পারে তাঁর 'প্রকৃত প্রয়োজন' এবং 'অপ্রকৃত আরোপিত প্রয়োজন'-এর মধ্যে। 'বিজ্ঞাপন' একজন ব্যক্তি মানুষের কাছে তাঁর আত্মপরিচয় খোঁজার পথগুলিতে পণ্যমুখিন অবক্ষয়কে প্রতিস্থাপিত করে, এর ফলে ব্যক্তি এক আলো-আঁধারি খেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞাপিত দুনিয়া ব্যক্তি মানুষের সামনে 'এক কৃত্রিম প্রয়োজনীয়তা'র অপ্রযোজনীয় চটকদারি বুদবুদ তৈরি করে। বিজ্ঞাপন এমন এক সামাজিক নৈতিকতা বা মর্যাদা নির্ণায়ক মাত্র তৈরি করে যেখানে ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার পরিমাণ বা পরিসংখ্যান হয়ে যায় তার মানক। বাজারে বিক্রিত কোনও কোম্পানির শ্যাম্পু বা দাঁতমাজন হয়ে ওঠে যৌন আবেদনের সংবাহক, গাড়ি কেনা হয়ে ওঠে সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের অঙ্গ। পোশাক - পরিচায়ক এবং সর্বোপরি বিজ্ঞাপন বার্তা আসে

মানুষের সব সমস্যার 'মুশকিল আসান' রূপে। আর তাই এই তাত্ত্বিক সূত্রেরই ফলিত রূপ দেখেছি আমারই শিক্ষক এবং পরবর্তীকালে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে আমি যখন তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি এবং বিভিন্ন সময়ে 'বামপন্থী আন্দোলন' সংক্রান্ত কত আলাপ আলোচনা শুনেছি এই ভেবে যে হয়তো তাঁর মধ্যে এক বিকল্প পথের সন্ধান আছে, তাঁর মধ্যে। মোহভঙ্গ হয়েছে যখন দেখেছি জীবনচর্যা এবং জীবনচর্চার মধ্যে কতটা ফারাক। তিনি কোনও শিক্ষক সংগঠনের সদস্য ছিলেন না। জানি না কতটা সচেতন বা কতটা অচেতনভাবে বৈভবপূর্ণ জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে ভোগবাদী মতাদর্শের বিমূর্ত সদস্যপদ গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁর সিঙ্গাপুর ব্যাঙ্কক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য স্টাফ রুমে দেখেছি উপচে পড়া ভিড়। স্কুল শিক্ষকের বিদেশ ভ্রমণে কোনও অন্যায় আছে বলে আমি মনে করি না, কিন্তু ভ্রমণ সংক্রান্ত গল্পের অধিকাংশ জুড়ে লাস্যময় জীবন বৃত্তান্তকে পরিবেশন এবং অনেক শিক্ষকের চোখে উত্তেজনার আগুন পোহানোর প্রবল কাঙ্খিত ইচ্ছার ছায়াপাত, যা পূর্বেই 'কৃত্রিম তাপ' বলে উল্লেখ করেছি, তারই ব্যবহারিক উপস্থাপন দেখে অবাক হয়েছি।

যে অধিকার ভাবনা বাঙালিকে সচেতন করেছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই বোধের জমিতেই সংগঠিত বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার নিজের জায়গা করে নিয়েছিল। তাঁরা বাঙালিকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের শেষ লক্ষ্য হবে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে অধিকারগুলো সমানভাবেই সবাই ভোগ করার সুযোগ পাবেন, অর্থাৎ এই অধিকার ভাবনাকে বামপন্থীরা চেষ্টা করলেন একে সামগ্রিক সমাজ ভাবনা, ও সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করতে। তাঁর যে সমাজ ভাবনা, সামাজিক স্বার্ধের ধারণা বাঙালি মননে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করলেন তাকে সচেতনভাবে গ্রহণ করার মতো বাঙালির কোনও বৌদ্ধিক প্রস্তুতি ছিল না বলে অধ্যাপক শোভনলাল দাশগুপ্ত মনে করেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি যাঁদের ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল তাঁরা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানগতভাবে বিদ্যালয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানকারী শিক্ষক সমাজ। খানিকটা আক্ষেপের সুরেই এবং বিচক্ষণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অতি সম্প্রতি অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'কম্যুনিস্ট মানিফেস্টো: ভারতবর্ষ এবং আমরা' -তে মন্তব্য করেছেন, 'যাদের কেন্দ্র করে (বাম দলগুলি উদ্দেশ্যে) এই প্রত্যাশার আবর্ত, তাঁরা শুধু অন্তসারশূন্যতায় দীন নয় এক কথায় চরিত্রহীন। এই চরিত্রহীনতা শুধু মানুষের নিকট পৌঁছতে না পারার ব্যর্থতার মধ্যেই অভিব্যক্ত নয়, বৈপ্লবিক আদর্শের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা এবং উপস্থিত সুবিধাবাদের গরজে আদর্শকে স্থিত না থাকার। দুর্বলতা ইত্যাদি তো ঔপনিবেশিক বুদ্ধীজীবীদের উৎস ও বিবর্তনগত বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত ছিল। তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সন্তান, সত্য অর্থে অবৈধ সন্তান। ইংল্যান্ডে বিতৃত্ব তাঁর কখনো অস্বীকার করেননি ইংল্যান্ডের পিতৃত্ব তাঁরা কখনো অস্বীকার করেননি। তাই দ্বিধা, পরিণামে আনুগত্য।'[২] এরই সঙ্গে এটাও দেখতে পেলাম, সামাজিক প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় ছোট বৃত্ত এবং বড় বৃত্তের মধ্যে একইসঙ্গে সম্পর্কিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা আলাদা বিশিষ্টতার জায়গা নিয়ে নেয়।

রাজনীতির টানাপোড়েন

আলোচিত সামাজিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে এবার চেষ্টা করব 'বিদ্যালয়'কে কেন্দ্র করে রাজনীতি কীভাবে আবর্তিত হয় তা দেখতে। এখানেও পূর্বের ন্যায় 'ছোট বৃত্ত' ও 'বড় বৃত্ত' বলতে এখানে আমি তুলে ধরব মোটা দাগের রাজনৈতিক প্রভাবে বিদ্যালয়গুলি কীভাবে বিভাজিত হয় 'বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত এবং 'ছোট বৃত্ত' বলতে সেইসব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য করা বৃত্ত' -এর ক্রিয়াকলাপ কতটা শক্তিশালী এবং সামাজিকভাবে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা ও আপোষের জমিকে ক্রমেই প্রসারিত করেছে তা আলোচনার মধ্য দিয়েই আশা করি ধরা দেবে। রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বলতে আমি আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার মূলত পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্টের ৩০ বছর শাসককালের সমকালের মধ্যে।

'বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হল পাঠ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা।'[৩] বাস্তবে কোনও সাধারণ স্কুল সংগঠন করতে গেলে শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর নিয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয়। এই স্তরগুলো হতে পারে শিক্ষার্থীর বয়স ও তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক বিকাশের মান অনুসারে এবং স্কুলের ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুসারে। সাধারণ সংস্কৃতির স্কুলের লক্ষ্য হতে পারে তরুণ-তরুণীদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রবেশ করানো এবং সেই উদ্দেশ্যে তাদের মানসিক পরিণতি সাধন করা, মনন কর্ম ও বাস্তব কর্মের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা ও স্বাধীন কর্মোদ্যম ও সদিচ্ছার সঞ্চার করা। বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যাবার বয়স নির্ধারণ করার প্রশ্নটা সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। সাধারণ স্কুলগুলোর খরচের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হতে পারে—শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রস্তাবগুলি উঠে এসেছিল আনমোনিও গ্রামশির সুচিন্তিত মতামত রূপে। আমাদের দেশ, বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের ক্ষমতালাভের সাথে সাথে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও একটা বড়সড় রদবদল ঘটেছিল। আমার দৃষ্টি শিক্ষানীতির পরিবর্তন নিয়ে বিশেষ আলোকপাতের বদলে বিগত ত্রিশ বছরেরও অধিককালব্যাপী এই শিক্ষানীতির ব্যবহারিক বা ফলিত রূপ হিসাবে বিদ্যালয়গুলির সমসাময়িক অবস্থান এবং তৎসংক্রান্ত বিদ্যালয়ের ভেতরে এবং বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সামাজিক পরিসরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের দিকে বেশি নজর দেবে।

বামপন্থীরা যে বিকল্প সমাজ ভাবনায় বাঙালিকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেছিল তার সঙ্গে প্রাক্ - আধুনিক সামাজিক বোধের ছিল আসমান-জমিন ফারাক। আবার ব্রিটিশ আধুনিকতার সাহচর্যে এসে বাঙালি যে অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হল, সেখানে সামাজিক স্বার্থ, সমাজের ভালো মন্দ ইত্যাদি শব্দগুলোই হয়ে দাঁড়াল অপ্রাসঙ্গিত বা নিরর্থক; কারণ এই আধুনিকতা ও অধিকার ভাবনা ব্যক্তিকে স্থাপন করে পুরোপুরিই সমাজের বিপরীতে এবং ব্যক্তি স্বার্থকে বৈধতা দেয় যে যৌক্তিকতা, সেটিই পেয়ে যায় এক চিরন্তন মাত্রা। এরই ফল হিসাবে মাধ্যম মানের শিক্ষাগত উৎকর্ষতা নিয়ে উঠে আসে এক বিরাট সংখ্যক আনুগত্যপ্রবণ, স্বার্থমগ্ন এবং আপোসকারী শিক্ষক সমাজ। বড় বৃত্তের ছবিতে অবশ্য ধরা পড়ে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, জনশিক্ষার প্রসারকল্পে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ইংরেজি ভাষার উপর গুরুত্ব হ্রাস ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের এক বিরাট ফর্দ। এই ফর্দকে আবার রাজনৈতিক ভোট ব্যাঙ্ক এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বেঁধে ফেলার জন্য বেছে নেওয়া হল বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের বাৎসরিক সম্মেলন মঞ্চগুলিকে। বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি যে মানসিকতার জন্ম দেয় তা থেকে সৃষ্টি হয় এক ধরনের ফাঁপা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, অন্তঃসারশূন্য অহংবোধ, নির্লজ্জ দাপট ও দাদাগিরি এবং সর্বোপরি এক ধরনের অতি নিকৃষ্ট বস্তুতান্ত্রিকতা যা থেকে জন্ম নেয় ভোগবাদ। বর্তমান সময়ে সারা পশ্চিমবাংলাব্যাপী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিরাট অংশের মধ্যে যে অহংবোধ, অপরের প্রতি অসহিষ্ণুতা, নিজেকে সবজান্তা মনে করা, হুজুগের পিছনে ছোটা, নিজের অধিকার কায়েম করার জন্য অগ্রণী হওয়ার যে চিত্রটা আমরা দেখি সম্ভবত তার তত্ত্বগত কারণটা লুকিয়ে আছে এই জায়গাতে। শিক্ষক সিহাবে যে সামাজিক গ্রহণীয়তা, একজন ব্যক্তি মানুষ হিসাবে বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান এবং তাঁর শারীরিক ভাষা যে ব্যবহারিক জীবনেকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত তা ছিল এক সামাজিকীকরণের সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। কিন্তু এই সময় সাপেক্ষতাকে তাঁরা সহজেই অতিক্রম করার পন্থা পদ্ধতি আবিষ্কার করল রাজনৈতিক দলের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি, পঞ্চায়েত প্রধান, পৌরসভার কাউন্সিলর ইত্যাদি হওয়ার মাধ্যমে।

এই ধরনের সুবিধাবাদী মানসিকতাকে মতাদর্শের নামে বিকৃত মোড়কে মুড়ে একটা নিয়মক্রম বা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়

তার উদ্দেশ্যগত মহৎ প্রচেষ্টাগুলিকে; যা ক্ষমতায় আসার আগে বহু শিক্ষকের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে সামাজিক রূপান্তরের বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। একই সঙ্গে শাসকবর্গ ও শিক্ষক সমাজের একটা বিরাট অংশের মধ্যে আঁতাত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতার সম্পর্ককে বৈধতা প্রদানের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করল। শাসকবর্গও এরই সূত্র ধরে পরিকল্পনামাফিক ব্যক্তিকে সংগঠিত করে একটা নিয়মানুবর্তিতায় নিয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে তাদের তৈরি শাসন কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করতে অভ্যস্ত করে তোলে। এই ব্যবস্থা প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের মতোই ব্যক্তি মানুষ হিসাবে শিক্ষকদের অবক্ষয় ঘটিয়ে ভোগবাদী সমাজের বিস্তার ঘটাচ্ছে।

এইবার ছোট বৃত্তের কথায় আসা যাক। এই 'ছোট বৃত্ত' বলতে আমি মূলত বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালন সংক্রান্ত দিক এবং তৎসহ বিদ্যালয়কে অবস্থান করে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক বা আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের চালচিত্রকে বোঝাচ্ছি। বড় বৃত্তের সামাজিক - রাজনীতিক প্রভাব ছোট বৃত্তকে প্রভাবি করলেও এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, এই বৃত্তের চালচিত্র ধরা দেয় না। এই বৃত্তের চালচিত্র নির্মাণে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং এক প্রাচীন শিক্ষক তুষার কান্তি দাশগুপ্ত যিনি যাদবপুরের একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটানা ৩৯ বছর ৪ মাস ৭ দিন শিক্ষকতা করে কিছুদিন আগের অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

প্র: কত সাল থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করছেন?

উ: ১৯৫১ সাল থেকে।

প্র: কোন সময় থেকে আপনি শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হন?

উ: ১৯৬৭ সালের ২৫ আগস্ট।

প্র: নিযুক্তির সময়কাল থেকে আপনি কোনও শিক্ষক সংগঠনের সদস্য হন?

উ: হ্যাঁ। এ বি টি এ। কারণ হিসাবে বলা যায় তখন একটাই শিক্ষক সংগঠন ছিল। ১৯৬৯ সালে সেন্ট লরেন্স স্কুলে সংগঠনের সম্মেলনের পর এই সংগঠন ছেড়ে দিই।

প্র: কেন ছেড়ে দিয়েছিলেন?

উ: সম্মেলন চলাকালীন একটি ঘটনার প্রতিবাদে। আগত এক প্রতিনিধি সংগঠনের এক নেতৃত্বকে সমালোচনা করায়, তাঁকে ধাক্কা মেরে, মাইক কেড়ে নিয়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।

প্র: পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের সময় স্টাফ রুমে কোনও প্রভাব পড়েছিল?

উ: অধিকাংশ শিক্ষকেরই মতাদর্শগত কোন জোরালো দায়বদ্ধতা না থাকায় ক্ষমতার স্রোতে গা ভাসানোর প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। আমাদের এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুবিধাবাদী রাজনীতির ঝোঁকটা বেশি ছিল।

প্র: রাজনৈতিক মতান্তর কি সহকর্মীদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছিল?

উ: প্রথম পর্যায়ে এটা ছিল না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পর থেকে খানিকটা শুরু হয় এবং গত শতকের নব্বই-এর দশকে চূড়ান্ত আকার নেয়

প্র: এমন কোনও ঘটনা মনে আছে যা রাজনৈতিক দলাদলিতে অতিক্রম করে বিদ্যালয়ের স্বার্থে কাজ করেছিল?

উ: এক. বিদ্যালয়ের জমি দখলকারী পার্শ্ববর্তী ক্লাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯৮৯-৯০)।
দুই. প্রমোশন নিয়ে শিক্ষদের ঘেরাও করা হয়, বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে চাপ সৃষ্টি করা হয় ১৯৯০ সালে। তখন একযোগে প্রতিবাদ করি আমরা।

প্র: প্রধান শিক্ষককে প্রশাসক হিসাবে দেখতে পছন্দ করেন না সহকর্মীদের মধ্যে প্রধান হিসাবে?

উ: সহকর্মীদের মধ্যে প্রধান। শুধু প্রশাসক হলে শ্রেণিগত বিভাজন অবধারিত এবং শ্রেণি সংঘাত তৈরির প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। মানসিক সন্তুষ্টি এখানে একটা বড় বিষয় হিসাবে কাজ করে বিদ্যালয় পরিচালনে।

প্র: স্টাফ কালচার কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্ম দেয়?

উ: মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী মন এখানে একটা বড় ভূমিকা নেওয়ায় রাজনৈতিক আলোচনা চা পানের আসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে।

প্র: আপনার কর্মজীবনের শেষ পাঁচ বছরের স্টাফ রুম কালচারের তিনটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা বলুন।

উ: এক. প্রধান শিক্ষক হয়ে দাঁড়ায় বেসরকারি কোম্পানির ম্যানেজার যার ফলে শ্রেণি সংঘাত চরমে পৌঁছয়।
দুই. বাইরের রাজনীতির প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে যায়। তাঁরা স্বাধীন বিদ্যালয় কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র পরিসরে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।
তিন. সামাজিক দায়বদ্ধতা অনেকটা চলে গেছে। অফিস আর বিদ্যালয়, কর্মগত প্রশ্নে সামাজিক নৈতিক ব্যবধানটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শিক্ষকরা পরিণত হচ্ছে যান্ত্রিকতার ফসল রূপে।

বামফ্রন্টের ত্রিশ বছরে শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশের সুবিধাবাদী আপোশ শুধুমাত্র 'বড় বৃত্ত' - এর রাজনীতির বহিরঙ্গেই নয়, তার অন্তরঙ্গেও মূল বিস্তার করেছে, বিস্তার করেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সৃষ্টি করেছে এক সর্বব্যাপী 'dependency syndrome'। একদিন যা ছিল আংশিক এবং কোনও ফলাফলবিহীন আজ সেই ভেদই হয়ে দাঁড়ায় অভিশপ্ত সুবিধা বিশেষ, প্রতিটি সত্তার মূলভাব।

আত্মকর্তৃত্বের অধিকারই মানুষের সত্যিকারের অধিকার। ম্যাকসওয়েভার তাঁর লেখায় ক্ষমতা এবং প্রভুত্বের মধ্যে একটা তফাত করেছিলেন। আসলে ক্ষমতা তখনই প্রভুত্বের দাবিদার হয় যখন ক্ষমতা যাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তারা সেটাকে ন্যায্য বলে মনে করেন। যেবে আজকের সময়ে যে কোনও শিক্ষক সংগঠনের সম্মেলনগুলির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। কতগুলি প্রস্তাব পাঠ, দাবি দাওয়ার একা খসড়া তৈরি এবং তৎসহ মুষ্ঠিমেয় তাত্ত্বিক নেতা যারা আগত প্রতিনিধির অভিভাবক সুলভ আচরণে অভ্যস্ত, তাদের ভাষা প্রদান। আমার নেওয়া সাক্ষাৎকারের একটি অংশ থেকেই পরিষ্কার, অনেকদিন আগে থেকেই উচ্চতর নেতাদের সমালোচনার অধিকার হারিয়ে তাঁরা বসে আছেন। 'আইনেরও যাচাই হয় আইনোত্তর আর একটা মাপকাঠিতে। যেটা হল সমকালীন ন্যায় এবং নীতিবোধ যা জনমানসে সৃষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়, যা অস্পষ্ট হলেও কখনও অনুপস্থিত নয়। যার মধ্যে একটা প্রচন্ড শক্তির বীজ নিহিত থাকে। রাজার শাসন বা প্রচলিত আইনের যাচাই -এর কাজটা কখনও থেমে থাকে না। সেটা হয় জনমানসে সমাজের দ্বারা সামাজিক নীতিবোধের নিরিখে। যখন সেখানে ব্যাঘাত ঘটে তখন প্রভুত্ব বৈধতা হারিয়ে শুধুই ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রকাশ হয়ে ওঠে। আর তখন সেই কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়া হয়ে দাঁড়ায় অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া।'[৫]

আর এইভাবেই গোটা শিক্ষক সমাজকে হারাতে হচ্ছে সামাজিক গ্রহণীয়তার অর্জিত জমিকে। এই সামাজিক গ্রহণীয়তা বা মান্যতা প্রাপ্তি একদিনে ঘটেনি।

ঘটেছে দীর্ঘকালব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির আঁতুড় থেকে। এই অর্জিত সামাজিক জমির লোভ বরাবরই ছিল সমাজের অন্যান্য এককগুলির। যাদের মধ্যে অন্যতম রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়ার একাংশ। 'শিক্ষক" পরিচিতিকে তাই চেষ্টা করা হেছ অফিসে কর্মরত কর্মচারীর সঙ্গে এক করে দিতে অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে সমাজের কাছে তুলে ধরতে যাতে সমাজের কাছে বাড়তি কোনও মান্যতা প্রাপ্তির সুযোগ শিক্ষক সমাজের না থাকে। এটা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনারই অঙ্গ বলে আমার মনে হয়।

পরিশেষে রোমানিয়ান দার্শনিক ই এম সিওরান লিখিত 'A Short History of Delay'-র 'The Faces of Deladenic'-এর সুত্র ধরে বলতে হয় 'যে সমস্ত সভ্যতা ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায়, তাদের কাছে গোধূলি শান্তির লক্ষণ। ...মধ্যাহ্ন পর্বে আমরা মূল্যবোধগুলি সৃষ্টি করি। গোধুলিতে রিক্ত এবং পরাস্ত হয়ে আমরা তাদের মুছে ফেলি। অবক্ষয়ের ভাবনা সেই যুগগুলির সব সত্যগুলির অন্য আর কোনোই জীবন নেই... যখন তারা স্তূপাকৃত হয় নিষ্পাণ বিষাদচিত্তে, স্বপ্নের অস্তিপ্রান্তরে কঙ্কালের মতো...।'[৫] Genealogy of fanaticism অধ্যায়ে প্রবেশের মুখে সিওরান, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের তৃতীয় রিচার্ড থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যা দিয়ে আমার আলোচনার ইতি টানা যথাযথ এবং প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়: 'ঘন কৃষ্ণ বিষাদ তোমার সঙ্গ নেব, আমারই সত্তার বিরুদ্ধে আর শত্রু হয়ে উঠব স্বয়ং আমারই।'

সূত্র নির্দেশ:

১. শোভনলাল দাশগুপ্ত, বাঙালি মনন: কিছু বিতর্কিত ভাবনা; আকাদেমি পত্রিকা, চুতর্দশ সংখ্যা, মে ২০০২, পৃ: ৭০।
২. অরবিন্দ পোদ্দার, কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো: ভারতবর্ষ এবং আমরা; পৃ: ১১২-১১৩।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যক্তিত্ব [ভাষান্তর: সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৬২]
৪. শৈল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা; আলোচনাচত্র, সংকলন ২৩, জানুয়ারি ২০০৬।
৫. দিলীপ ঘোষ, অবক্ষয়ের মুখগুলি; আলোচনাচক্র, সংকলন ২৩, জানুয়ারি ২০০৬।